লিঙ্গ : সামাজিক নির্মাণ
(Gender : Social Construction)

✣ 'সেক্স' (Sex) এবং 'জেন্ডার' (Gender) :

জন্মের পর থেকেই আমাদের জীবন জৈবিক পরিচিতি দ্বারা চিহ্নিত হতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে তা আরো বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এমনকি আমরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠি তখনও সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলির সর্বব্যাপী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এর প্রকাশ দেখা যায় সমাজ প্রত্যাশিত আমাদের আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের মধ্যে। ১৯৫০-এর দশকের আগে পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্য বা সমাজবিজ্ঞানেও 'সেক্স' ও 'জেন্ডার' ধারণা দুটির মধ্যে পার্থক্য ছিল না। দুটো ধারণাকে সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হত। ১৯৫০-এর দশক থেকে আমেরিকান ও ব্রিটিশ মনস্তত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য পেশাজীবিরা 'ইন্টারসেক্স' (intersex) ও 'ট্রান্সসেক্সুয়্যাল' (trans-sexual) মানুষদের নিয়ে কাজকর্ম করতে গিয়ে সেক্স ও জেন্ডার ধারণাদুটির মধ্যে পার্থক্য করতে শুরু করেন।

সেক্স বলতে সাধারণ নারী এবং পুরুষের মধ্যে দৈহিক ও শারীরিক পার্থক্যকে বোঝায়। অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে জৈবিক পার্থক্যই হল সেক্স। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে জননেন্দ্রিয় (Genitalia) ও জিনগত পার্থক্য আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকভাবে দেখা যায়। যেমন পুরুষ ও নারীর জননেন্দ্রিয় পৃথক প্রকৃতির। আবার নারী ও পুরুষের দেহের মধ্যে পৃথক পৃথক হরমোনের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। মহিলাদের যেমন ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরণ হরমোনের আধিক্য রয়েছে, পুরুষদের সেখানে টেস্টোস্টেরণ হরমোনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে মহিলাদের শরীরে XX ক্রোমোজোম পরিলক্ষিত হয় এবং পুরুষদের শরীরে সেখানে XY ক্রোমোজোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অপরদিকে জেন্ডার হল নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভেদ। World Health Organization (WHO)-এর দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী জেন্ডার হল

"... the socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes that a given society considers appropriate for men and women" (From Wikipedia). অর্থাৎ এই সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজবিধি, ভূমিকা, সম্পর্ক ইত্যাদির ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সামাজিকভাবে নির্মিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তাকেই বলে জেন্ডার। কোনো একটি সমাজ যখন নারী ও পুরুষের মধ্যে ভূমিকা, আচরণবিধি, ক্রিয়াকর্ম ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে তার ভিত্তিতে নারী-পুরুষ প্রভেদ সৃষ্টি করে তখনই তাকে জেন্ডার বলে।

যেহেতু সেক্স বলতে জৈবিক ও শারীরিক পার্থক্যকে বোঝায় তাই সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে সেক্স-এর অর্থাৎ নারী-পুরুষের জৈবিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির পার্থক্য সমাজ-সংস্কৃতিভেদে একই রকম থাকে। কিন্তু জেন্ডার বিষয়টি যেহেতু সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত তাই সমাজ সংস্কৃতি ভেদে জেন্ডারের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এজন্যই নারীসুলভ আচরণ ও পুরুষসুলভ আচরণ অথবা পোশাকবিধিগুলি সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

❖ লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ (Gender : Social Construction) :

যখনই একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখনই তাকে ছেলে অথবা মেয়ে হিসাবে চিহ্নিত করা হয় মূলত তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য থেকে। অর্থাৎ জন্মগহণের পরই তাকে জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়। একেই বলে 'সেক্স' (Sex)। অর্থাৎ সেক্স হল নারী-পুরুষের শারীরিক ও জৈবিক প্রভেদ। এখন প্রশ্ন হল মানুষ কিভাবে নারী বা পুরুষ হিসাবে তার লিঙ্গগত পরিচিতিকে নির্মাণ করে থাকে? মানুষের এই লিঙ্গগত পরিচিতি কি শুধুমাত্র জৈবিকভাবে নির্ধারিত হয়? সেই পরিচিতি নির্মাণের ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কৃতির কোনো বিষয়ের প্রভাব রয়েছে কি? সাধারণভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে বা নারীত্ব ও পুরুষত্বের মধ্যে যখন পার্থক্যটি নির্ধারিত হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে তখন সেই বিষয়টিকে বলা হয় জেন্ডার (Gender)। অর্থাৎ "Gender refers to non-biological, culturally and socially produced distinctions between men and women and between masculinity and feminity." (Calhoun; Light & Keller 1997:240)

জন্মের পরই পিতামাতা তাদের সন্তানকে তার লিঙ্গ পরিচিতি অনুযায়ী পোশাক কিনে দেয়, তাদের সেই অনুযায়ী সাজায়। সমাজ তার লিঙ্গ পরিচিতি অনুযায়ী কতকগুলি নিয়মবিধি, ভূমিকা স্থির করে দেয় এবং শিশুকেও সেই সামাজিকভাবে কাঙ্ক্ষিত রীতিনীতি ভূমিকাগুলিকে মেনে চলতে হয়। সুতরাং একটি বিষয় স্পষ্ট যে, নারী-পুরুষের পার্থক্যটি জৈবিক হলেও কিন্তু এই পার্থক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে

পরিলক্ষিত হয়। বহুদিন ধরেই লিঙ্গগত পার্থক্যটি প্রকৃতপক্ষে জৈবিক না সামাজিক সেই বিষয় নিয়ে নানা বিতর্ক চলে আসছে। এই ধরনের বিতর্কগুলির মধ্যে প্রকৃতি-প্রতিপালন বিতর্ক (Nature versus Nurture debate) হল অন্যতম। নিম্নে এই বিতর্ক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

❑ লিঙ্গ পার্থক্য : প্রকৃতি বনাম প্রতিপালন বিতর্ক (Gender differences : Nature versus Nurture Debate) :

কিছু কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন যে, নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু অন্তর্নিহিত পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যগুলি প্রায় সমস্ত সমাজ সংস্কৃতিতে দেখা যায়। এই মতবাদটি মূলত সামাজিক-জৈবিক মতবাদ বা Sociobiology হিসাবে পরিচিত। Sociobiology তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন E.O.Wilson। মূলত চার্লস ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব তথা প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে David Barash 'সেক্স' ও 'জেন্ডার'-এর মধ্যে পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক-জৈবিক মতবাদ অনুযায়ী পুরুষ-নারীর মধ্যে জৈবিক প্রভেদ বর্তমান এবং এই কারণে তাদের সামাজিক ভূমিকার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। Barash-এর মতে নারী ও পুরুষের প্রজনন সংক্রান্ত জৈবিক পার্থক্যের কারণেই তাদের সামাজিক ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যৌন আচরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, পুরুষরা অনেক বেশি অবাধ যৌনাচারী মহিলাদের থেকে (Haralambos & Holborn 2000:130)। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মতপ্রকাশ করেন যে, প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতেই দেখা যায় যুদ্ধ বা শিকারে পুরুষরা অংশগ্রহণ করে, মহিলারা নয়। কারণ পুরুষেরা জৈবিকভাবে মহিলাদের থেকে বেশি আক্রমণাত্মক। কিন্তু সামাজিক-জৈবিক মতবাদের এই বক্তব্যকে অনেকেই মেনে নেননি। কারণ এদের মতে পুরুষদের আক্রমণাত্মক প্রবণতার মাত্রা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন এবং অনেক সংস্কৃতিতে নারীদেরকে নিষ্ক্রিয় হিসাবেই রাখা হয়। কারণ নারীদের এই নিষ্ক্রিয়তা হল সমাজ কাঙ্ক্ষিত। সুতরাং নারী-পুরুষের এই পৃথক বৈশিষ্ট্য জৈবিক নয়, বরং সামাজিক। এদের মতে প্রায় প্রতিটি সমাজেই নারীদেরকে সন্তান লালন পালনে বেশি সময় অতিবাহিত করতে হয় বলে যুদ্ধ বা শিকারে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। তাই এদের মতে নারী-পুরুষের আচরণগত পার্থক্য সামাজিক শিক্ষারই ফসল, জৈবিক নয়। তবে অনেক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক নারী-পুরুষের পার্থক্যকে জৈবিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন নৃতাত্ত্বিক George Peter Murdock মত প্রকাশ করেন যে, নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যের কারণেই সমাজে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। তিনি শিকারী সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মতো

পরিলক্ষিত হয়। বহুদিন ধরেই লিঙ্গগত পার্থক্যটি প্রকৃতপক্ষে জৈবিক না সামাজিক সেই বিষয় নিয়ে নানা বিতর্ক চলে আসছে। এই ধরনের বিতর্কগুলির মধ্যে প্রকৃতি-প্রতিপালন বিতর্ক (Nature versus Nurture debate) হল অন্যতম। নিম্নে এই বিতর্ক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

☐ লিঙ্গ পার্থক্য : প্রকৃতি বনাম প্রতিপালন বিতর্ক (Gender differences : Nature versus Nurture Debate) :

কিছু কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন যে, নারী-পুরুষের মধ্যে কিছু অন্তর্নিহিত পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যগুলি প্রায় সমস্ত সমাজ সংস্কৃতিতে দেখা যায়। এই মতবাদটি মূলত সামাজিক-জৈবিক মতবাদ বা Sociobiology হিসাবে পরিচিত। Sociobiology তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন E.O.Wilson। মূলত চার্লস ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব তথা প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে David Barash 'সেক্স' ও 'জেন্ডার'-এর মধ্যে পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক-জৈবিক মতবাদ অনুযায়ী পুরুষ-নারীর মধ্যে জৈবিক প্রভেদ বর্তমান এবং এই কারণে তাদের সামাজিক ভূমিকার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। Barash-এর মতে নারী ও পুরুষের প্রজনন সংক্রান্ত জৈবিক পার্থক্যের কারণেই তাদের সামাজিক ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যৌন আচরণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, পুরুষরা অনেক বেশি অবাধ যৌনাচারী মহিলাদের থেকে (Haralambos & Holborn 2000:130)। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা মতপ্রকাশ করেন যে, প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতেই দেখা যায় যুদ্ধ বা শিকারে পুরুষরা অংশগ্রহণ করে, মহিলারা নয়। কারণ পুরুষেরা জৈবিকভাবে মহিলাদের থেকে বেশি আক্রমণাত্মক। কিন্তু সামাজিক-জৈবিক মতবাদের এই বক্তব্যকে অনেকেই মেনে নেননি। কারণ এদের মতে পুরুষদের আক্রমণাত্মক প্রবণতার মাত্রা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন এবং অনেক সংস্কৃতিতে নারীদেরকে নিষ্ক্রিয় হিসাবেই রাখা হয়। কারণ নারীদের এই নিষ্ক্রিয়তা হল সমাজ কাঙ্ক্ষিত। সুতরাং নারী-পুরুষের এই পৃথক বৈশিষ্ট্য জৈবিক নয়, বরং সামাজিক। এদের মতে প্রায় প্রতিটি সমাজেই নারীদেরকে সন্তান লালন পালনে বেশি সময় অতিবাহিত করতে হয় বলে যুদ্ধ বা শিকারে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। তাই এদের মতে নারী-পুরুষের আচরণগত পার্থক্য সামাজিক শিক্ষারই ফসল, জৈবিক নয়। তবে অনেক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক নারী-পুরুষের পার্থক্যকে জৈবিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন নৃতাত্ত্বিক George Peter Murdock মত প্রকাশ করেন যে, নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যের কারণেই সমাজে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। তিনি শিকারী সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের মতো

দুইশত চব্বিশটি সমাজের উপর গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, শিকার, গাছকাটা, খনন করার মতো কাজগুলি প্রায় প্রত্যেক সমাজেই পুরুষদের কাজ বলে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে সংগ্রহ করা, রান্না করা, জল আনা, খাবার তৈরি করার মতো কাজগুলি মহিলাদের কাজ বলেই বিবেচিত হয়। তাঁর মতে পুরুষদের শারীরিক ক্ষমতা মহিলাদের থেকে বেশি বলেই পরিশ্রমমূলক কাজগুলি পুরুষদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। Murdock বলেছেন, "Man with his superior physical strength can better undertake the more strenuous tasks, such as lumbering, mining, quarrying, land clearance and house building. Not handicapped, as is woman by the physiological burdens of pregnancy and nursing, he can range farther afield to hunt, to fish, to herd and to trade. Woman is at no disadvantage, however, in lighter tasks which can be performed in or near the home, e.g. the gathering of vegetable products, the fetching of water, the preparation of food, and the manufacture of clothing and utensils." (Haralambos & Holborn 2000:132) সুতরাং Murdock-এর মতে জৈবিক কারণেই লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন সমাজে তৈরি হয়েছে। অপর এক সমাজতাত্ত্বিক Talcott Parsons বলেছেন, সন্তানের সামাজিকীকরণের জন্য যে স্নেহ, উষ্ণতাপূর্ণ ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর প্রয়োজন তা মূলত মহিলাদের মধ্যেই বর্তমান এবং তাই সন্তানের সামাজিকীকরণে মহিলারাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "In our opinion the fundamental explanation of the allocation of roles between the biological sexes lies in the fact that the bearing and early nursing of children establish a strong presumptive primacy of the relation of mother to the small child" (ibid). সুতরাং Parsons-এর মতে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজনের ভিত্তি হল নারী-পুরুষের মধ্যে জৈবিক প্রভেদ। একইভাবে John Bowlby মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে মত প্রকাশ করেন যে, সন্তানের মানসিক বিকাশে মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, ভালোবাসা ও উষ্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন এবং মাতৃত্বের এই গুণগুলি মহিলাদের মধ্যেই বর্তমান। অর্থাৎ Bowlby একই মত পোষণ করে বলেন যে, লিঙ্গগত শ্রমবিভাজনের ভিত্তি হল জৈবিক। Murdock, Parsons এবং Bowlby-এর বক্তব্যকে Ann Oakley স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জৈবিক কারণে যে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন সৃষ্টি হয় তা তিনি মনে করতেন না। তিনি বলেছেন, "Not only is the division of labour by sex not universal, but there is no reason why it should be.

Human cultures are diverse and endlessly variable. They owe their creation to human inventiveness rather than invincible biological forces": (ibid :133). Oakley মত প্রকাশ করেন যে লিঙ্গগত ভূমিকাগুলি সাংস্কৃতিকভাবে নির্ধারিত, জৈবিকভাবে নয়। তাছাড়া তার মতে বিভিন্ন সমাজের তথ্য প্রমাণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, সন্তান প্রসব ছাড়া আর কোনো কাজই কেবলমাত্র নারী নির্দিষ্ট নয়। তাছাড়া জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলি নারীর কোনো পেশা বা জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না। তিনি এটাও বলেছেন যে, 'মায়ের ভূমিকা'টিও সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত। কারণ বিভিন্ন সমাজের গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সন্তান লালন পালনে নারী বা মায়ের ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই Oakley বলেছেন লিঙ্গ ভূমিকা জৈবিক নয়, বরং সাংস্কৃতিকভাবে তৈরি হয়। মানুষ সমাজ প্রত্যাশিত লিঙ্গ ভূমিকাগুলিকে সমাজ থেকেই শিখে থাকে এবং এই কারণে সমাজসংস্কৃতি ভেদে লিঙ্গগত ভূমিকাগুলির মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্যতা দেখা যায়।

❑ **প্রাণীদের উদাহরণ :** নারী-পুরুষের পার্থক্যের কারণ অনুধাবনের জন্য অনেকেই প্রাণীদের উদাহরণকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, হরমোনের কারণেই এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। এদের মতে, পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরণের উপস্থিতির কারণেই পুরুষরা বেশি হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়। উদাহরণের মাধ্যমে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, পুংলিঙ্গের বানরকে যদি জন্মের পরই লিঙ্গচ্ছেদ করে দেওয়া হয় তাহলে সেই বানর কম হিংস্র ও আক্রমণাত্মক হয়। অন্যদিকে যদি স্ত্রীলিঙ্গের বানরের দেহে টেস্টোস্টেরণ হরমোনের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় তাহলে সেই স্ত্রীলিঙ্গের বানরটি অনান্য স্ত্রীলিঙ্গের বানর অপেক্ষা বেশি আক্রমণাত্মক হয়। অর্থাৎ হরমোনের কারণেই আক্রমণাত্মক প্রবণতা দেখা যায়। সুতরাং হরমোনের কারণেই নারী-পুরুষের আচরণগত পার্থক্য দেখা যায় বলে এরা মনে করেন। কিন্তু বাস্তবে এটাও দেখা গেছে যে, আক্রমণাত্মক হলেও টেস্টোস্টেরণের ক্ষরণ বৃদ্ধি পায়। আবার অনেক স্ত্রীলিঙ্গের বানরও পরিস্থিতি সাপেক্ষে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। সুতরাং এই মতবাদকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায় না।

❑ **মানুষের উদাহরণ :** অভিন্ন যমজ শিশুর গবেষণার মাধ্যমেও নারী-পুরুষের আচরণগত পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। অভিন্ন যমজ শিশু একই মায়ের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছে। ফলে এদের জিনগত গঠন একই। একটি দুর্ঘটনার সময় দুটি অভিন্ন যমজ পুরুষ শিশুর মধ্যে একটিকে লিঙ্গচ্ছেদ ঘটানো হয়েছিল এবং তার যৌনাঙ্গকে নারীদের যৌনাঙ্গের রূপ প্রদান করা হয়েছিল।

এইরূপ শিশুটিকে তারপর কন্যা শিশুর মতোই লালন পালন করে বড়ো করা হয়। এদের যখন ছয় বছর বয়স হয় তখন তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ পৃথক পৃথক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হতে থাকে। এদের মধ্যে বালিকাটি বালিকাদের দলে খেলাধুলা শুরু করে, বাড়ির কাজে সাহায্য করে এবং বড়ো হয়ে কোনো পুরুষকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। অপরদিকে বালকটি বালকদের সাথে খেলাধুলা পছন্দ করে, বড়ো হয়ে পুলিশ হতে চায়।

সুতরাং এই উদাহরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, লিঙ্গগত ভূমিকা ও আচরণগুলি হল শিক্ষণীয় ব্যাপার। মূলত লিঙ্গ সামাজিকীকরণের (Gender Socialization) মাধ্যমেই এই শিক্ষা শিশুরা পেয়ে থাকে। অর্থাৎ জেন্ডার সামাজিকভাবে নির্মিত হয় এবং এই নির্মাণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ সামাজিকীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই লিঙ্গ সামাজিকীকরণ কিভাবে ঘটে তা নিয়ে এবার আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

✣ লিঙ্গ সামাজিকীকরণ (Gender Socialization) :

❑ পুরুষত্ব ও নারীত্বের বিকাশ :

লিঙ্গ সামাজিকীকরণ হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানব শিশু জন্মের পর থেকে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের সহায়তায় লিঙ্গ ভূমিকা ও লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং নিজেকে পুরুষ বা নারী হিসাবে গড়ে তোলে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নারী ও পুরুষ তাদের জৈবিক তারতম্যের ভিত্তিতে জীবন ধারাগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিভিন্ন বিষয়কে পার্থক্য করতে শেখে। সুতরাং বলা যায় যে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানবশিশু যখন লিঙ্গগত ভূমিকা, বৈশিষ্ট্য, আচার আচরণগুলি শিখে তার মধ্যে পুরুষত্ব বা নারীত্বের বিকাশ ঘটায় তখন সেই প্রক্রিয়াকে লিঙ্গ সামাজিকীকরণ বলে।

যে সমস্ত মাধ্যমগুলির সহায়তায় লিঙ্গ সামাজিকীকরণ ঘটে সেগুলির ভূমিকা নিম্নরূপ—

○ পরিবারের ভূমিকা : শিশুর লিঙ্গগত জ্ঞান অর্জনের সূত্রপাত ঘটে পরিবারের মধ্যেই। কারণ পরিবার হল শিশুর প্রথম আশ্রয়স্থল। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রাথমিক সামাজিকীকরণ পরিবারের মধ্যেই ঘটে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিশু সন্তানদের সমান চোখে দেখা হয় বলে দাবি করা হলেও বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। কারণ পিতামাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে থাকে। যেমন পিতামাতা বা অন্যান্য সদস্য কন্যা শিশুকে পুতুল খেলতে

দিচ্ছে, মেয়ের মতো সাজাচ্ছে, মেয়েদের পোশাক কিনে দিচ্ছে, খেলনা হিসাবে রান্নার সামগ্রী দিচ্ছে। কিন্তু পুত্রসন্তানকে ছেলেদের মতো পোশাক কিনে দিচ্ছে, ছেলেদের মতো কেশসজ্জা করছে, খেলনা হিসাবে বন্দুক, মোটরগাড়ি কিনে দিচ্ছে। পুত্রসন্তানকে তারিফ করার ক্ষেত্রে "Smart", "Handsome" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করছে। কিন্তু কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে "Cute", "Sweet", "Charming" ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করছে। এইভাবে দেখা যায় যে, পুত্র ও কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের পৃথক

দিচ্ছে, মেয়ের মতো সাজাচ্ছে, মেয়েদের পোশাক কিনে দিচ্ছে, খেলনা হিসাবে রান্নার সামগ্রী দিচ্ছে। কিন্তু পুত্রসন্তানকে ছেলেদের মতো পোশাক কিনে দিচ্ছে, ছেলেদের মতো কেশসজ্জা করছে, খেলনা হিসাবে বন্দুক, মোটরগাড়ি কিনে দিচ্ছে। পুত্রসন্তানকে তারিফ করার ক্ষেত্রে "Smart", "Handsome" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করছে। কিন্তু কন্যা সন্তানদের ক্ষেত্রে "Cute", "Sweet", "Charming" ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করছে। এইভাবে দেখা যায় যে, পুত্র ও কন্যা শিশুর ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের পৃথক পৃথক অনুভূতি রয়েছে এবং শিশুরা এদের প্রতিক্রিয়া, কথাবার্তা, আচরণ থেকে লিঙ্গ প্রভেদ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে থাকে। বস্তুতপক্ষে শিশুরা অনেকটা অবচেতনভাবেই লিঙ্গ শিক্ষা পেয়ে থাকে। শিশুরা নিজেদের ছেলে বা মেয়ে হিসাবে চিহ্নিত করার আগে বিভিন্ন ধরনের শব্দহীন ইশারা (Preverbal cues) লাভ করে। ক্রমে পোশাক পরিচ্ছদ, কেশসজ্জা দেখে শিশুর লিঙ্গজ্ঞান হতে থাকে। মোটামুটি দুই-তিন বছর বয়সে শিশুরা অল্প অল্প নারী-পুরুষের পার্থক্য সম্পর্কে বুঝতে পারে। শিশুর যখন পাঁচ-ছয় বছর বয়স হয় তখন তারা নারী-পুরুষের জৈবিক পার্থক্যকে বুঝতে পারে। খেলনা, ছবির বই এবং দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলিও তাদের মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্যের অনুভূতিগুলি জাগিয়ে তোলে। Vanda Lucia Zammuner ইতালি ও হল্যান্ডের সাত থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের খেলনা পছন্দের উপর একটি গবেষণা করেন। এক্ষেত্রে ছেলেদের খেলনা, মেয়েদের খেলনা এবং লিঙ্গ নিরপেক্ষ খেলনাগুলিকে রাখা হয়। যেহেতু হল্যান্ডের থেকে ইতালিতে লিঙ্গগত পার্থক্য সাবেকিভাবেই প্রকট, তাই গবেষণাতেও সেই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। দেখা যায় যে, হল্যান্ডের থেকে ইতালির শিশুরা অনেক বেশি লিঙ্গ নির্দিষ্ট খেলনাগুলিকে পছন্দ করছে। এমনকি ইতালির শিশুদের পিতা-মাতারাও ছেলেমেয়েদের জন্য লিঙ্গ নির্দিষ্ট খেলনাগুলিকেই উপযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ছেলেদের খেলনা ও মেয়েদের খেলনাকে পৃথক করে ছেলেদের জন্য ছেলেদের নির্দিষ্ট খেলনা এবং মেয়েদের জন্য মেয়েদের নির্দিষ্ট খেলনাগুলিকেই তারা বেছে নিচ্ছেন (Giddens 2000 : 93 & 94)। পরিবারের মধ্যে লিঙ্গ সামাজিকীকরণের ব্যাপারটি বিভিন্ন নৃকুলগত গোষ্ঠীতে বা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমনকি বিভিন্ন প্রজন্মে বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন ল্যাটিন আমেরিকান পিতামাতারা তাদের কন্যা সন্তানের কাছ থেকে সাবেকি নারীসুলভ বা কন্যাসুলভ আচরণ প্রত্যাশা করে। অথচ এই কন্যারা কিন্তু সাবেকি নারী ভূমিকা ও আচরণের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। মেক্সিকান এবং পুর্তোরিকান আমেরিকানদের মধ্যে যারা পুরাতন প্রজন্মের তাদের মধ্যে লিঙ্গগত প্রত্যাশাগুলি অনেক বেশি সাবেকি। মেক্সিকান

আমেরিকান পুরুষেরা কিন্তু ঐ দেশের নারীদের থেকে সন্তান লালন পালন সম্পর্কিত মহিলাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অনেক বেশি সাবেকি মানসিকতার (Andersen & Taylor 2007:302)।

০ সমবয়সী বন্ধুগোষ্ঠীর ভূমিকা : সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব ও ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুগোষ্ঠীর কাছে শিশু কিভাবে অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় সেগুলি যেমন শিখে থাকে তেমনি তারা এমন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারে যেগুলি বাড়ির বয়স্কদের সাথে পারে না। যেমন ফ্যাশন, পোশাক, জনপ্রিয় সংগীত, সিনেমা, নেশা, যৌনতা ইত্যাদি। কৈশোরে ও বয়ঃসন্ধিকালে শিশুদের নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার একটা অন্যতম মাধ্যম তাই সমবয়সী বন্ধুগোষ্ঠী। বলা যায় যে, লিঙ্গ সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাও সে এই বন্ধুগোষ্ঠী থেকেই পেয়ে থাকে। Janet Lever গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন বালকরা যখন বালকদের সাথে খেলাধুলা করে তখন তারা সেই সকল খেলাগুলিই পছন্দ করে যেগুলি প্রকৃতিগতভাবে জটিল, আক্রমণাত্মক, ঝুঁকিবহুল, দক্ষতাসাপেক্ষ এবং যেগুলির হার জিত আছে। অর্থাৎ পুরুষালী গুণ বা বৈশিষ্ট্য সমন্বিত খেলাগুলিই বালকেরা খেলে থাকে। অপরদিকে বালিকারা মূলত বালিকাদের সাথে কম ঝুঁকিবহুল, সহজ খেলা খেলে থাকে। Lever বলেছেন যে, বালিকা বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে বালিকারা মূলত সহযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ ভূমিকা অর্থাৎ স্ত্রী, মা সম্পর্কিত ভূমিকাগুলি শিখে থাকে। কিন্তু বালকেরা সেখানে পুরুষসুলভ গুণসমন্বিত শিক্ষাগুলি লাভ করে। Carol Gilligan তাঁর গবেষণাতে দেখিয়েছেন যে, খেলার মাধ্যমে বালক শিশুরা খেলার নিয়ম থেকে ন্যায্যতা বা যথার্থতা শিখে থাকে; বালিকারা সেখানে দায়িত্বশীলতা ও নৈতিকতার শিক্ষা লাভ করে থাকে (Macionis 2011:331)।

০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল এমন এক সামাজিক জগত যা শিশুর পারিবারিক পরিবেশ থেকে অনেক ভিন্ন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি এমন অনেক বিষয় আছে যা শিশু নিজের অজান্তে বা গোপনে নিষ্ক্রিয়ভাবেই শিখে যায়। যেমন সময়জ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা, প্রতিযোগিতা, হিংসা, এমনকি লিঙ্গ প্রভেদ। এই ধরনের শিক্ষাকে Ivan Illich বলেছেন 'গোপন পাঠ্যক্রম' বা 'Hidden Curriculum (Giddens 2000:416)। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বইগুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট। কারণ বইগুলিতে যেমন ছেলেদের ছবি ও নাম বেশি থাকে তেমনি ছবিগুলিতে নারী-পুরুষের ভূমিকার ছবিগুলিও লিঙ্গনির্দিষ্ট। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কিছু কিছু বিষয় ছেলেদের ও মেয়েদের ক্ষেত্রে পৃথক রয়েছে। বিদ্যালয়ে

পোশাকবিধিও ছেলে এবং মেয়েদের পৃথক। শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও ছাত্র ও ছাত্রীদের কাছ থেকে পৃথক পৃথক প্রত্যাশা থাকে। সুতরাং লিঙ্গগত পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের একটা অন্যতম মাধ্যম হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

○ **গণমাধ্যমের ভূমিকা :** দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও লিঙ্গগত ভূমিকা, আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদের পার্থক্য ব্যাপকভাবে চোখে পড়ে। ছোটোদের জন্য যে কার্টুনগুলি দেখানো হয় সেখানে রোমাঞ্চকর অভিযান, গোয়েন্দাগিরি, যুদ্ধ ইত্যাদিতে পুরুষ চরিত্র প্রধান ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে রূপকথার পরী বা গার্হস্থ্য কাজগুলিতে মহিলা চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়। বড়োদের অনুষ্ঠানের ঠিক একই ব্যাপার দেখা যায়। এমনকি দূরদর্শন বা পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনেও লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট। যেমন গার্হস্থ্য জিনিসপত্র, সাবান, সৌন্দর্য প্রসাধনের দ্রব্য ইত্যাদিতে মহিলারা এবং গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, অ্যালকোহল ইত্যাদি বিজ্ঞাপনে পুরুষেরা অভিনয় করেন। বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিজ্ঞাপনে পুরুষ অভিনেতারা মহিলা অভিনেত্রী থেকে লম্বা, যা পুরুষ আধিপত্যকে প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে মহিলারা বিছানা বা সোফাতে শুয়ে আছে শিশুদের মতো, যা নারীদের অধস্তন অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। পুরুষদের মৌখিক অভিব্যক্তি এবং আচরণেও দাম্ভিকতা, আধিপত্য ফুটে ওঠে। অপরদিকে মহিলাদের মৌখিক অভিব্যক্তি ও আচরণে নিষ্ক্রিয়তা, শিশু সুলভতা, যৌন আবেদন ফুটে ওঠে। বিজ্ঞাপনগুলিতে আবার সৌন্দর্যের ধারণাতেও নারী-পুরুষের পৃথক চিত্র ফুটে ওঠে (Macionis 2011:331-332)। দূরদর্শন ছাড়াও জনপ্রিয় সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যম যেমন রেডিও, পত্রিকা, সংবাদপত্র, সিনেমা ইত্যাদিগুলিতেও নারীত্ব ও পুরুষত্বের পৃথক পৃথক ইমেজ তুলে ধরা হয়। গণমাধ্যমের এই সমস্ত ছবি, ধারাবাহিক, সংগীত, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, নৃত্য ইত্যাদিগুলি ব্যক্তি মানুষের আত্ম-অনুভূতিকে ও আত্ম-পরিচিতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং সাথে সাথে ব্যক্তি মানুষের লিঙ্গ পরিচিতি নির্মাণেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

○ **ধর্মের ভূমিকা :** লিঙ্গ সামাজিকীকরণে ধর্মের ভূমিকাকে অনেক সময় উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু ধর্মও লিঙ্গ সামাজিকীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আমেরিকার Judeo-Christian ধর্মগুলি লিঙ্গগত পার্থক্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় এবং এখানে নারীদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। পশ্চিমী ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিতেও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো পরিলক্ষিত হয় এবং নারীদেরকে খুবই কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেক ধর্মের নীতিকথাও সমাজে নারীদের প্রতি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সৃষ্টি করে থাকে। আবার অনেক ধর্মের নীতিকথা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। সুতরাং বলা

যায়, লিঙ্গগত পার্থক্য বা বৈষম্যের অথবা লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষাও মানুষ ধর্ম থেকে পেয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। জন্মের পর শিশুর জ্ঞান হওয়ার সময় থেকেই সমাজের বিভিন্ন মাধ্যমের সহায়তায় নারী-পুরুষের কাজকর্ম, ভূমিকা, আচার আচরণ, বেশভুষা, চাল চলন প্রভৃতির পার্থক্যগুলি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে তার লিঙ্গ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াটি ঘটে থাকে।

✣ লিঙ্গ ভূমিকার সামাজিক নির্মাণ (The Social Construction of Gender Roles) :

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, Ann Oakley স্বীকার করেননি যে, লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন জৈবিক কারণে সৃষ্টি হয়। Murdock, Parsons এবং Bowlby-এর বক্তব্যকে এই কারণে তিনি সমালোচনাও করেছেন এবং প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, লিঙ্গগত শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে কোনো জৈবিক ভিত্তি নেই।

Murdock-কে সমালোচনা করে Oakley বলেন, লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন সার্বজনীন নয় এবং কোনো কাজই লিঙ্গ নির্দিষ্ট নয়। তিনি মনে করেন Murdock মূলত পশ্চিমী ও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এই কারণে তা পক্ষপাতদুষ্ট। Murdock যে দুইশত চব্বিশটি সমাজের উপর গবেষণা করেছিলেন তার মধ্যে থেকেই নমুনা নিয়ে Oakley দেখান যে, অন্তত চোদ্দটি সমাজে গাছ কাটার কাজ হয় মেয়েরা করে অথবা ছেলে ও মেয়ে উভয়ই করে। আর প্রায় ছত্রিশটি সমাজে মেয়েরা কৃষিজমি পরিষ্কারের কাজটি করে এবং আটত্রিশটি সমাজে রান্না করার কাজটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ে সম্পাদন করে। সুতরাং তার মতে Murdock-এর গবেষণা লিঙ্গগত শ্রমবিভাজনের সঠিক চিত্রকে প্রকাশ করে না।

Oakley নিজেও অনেকগুলি সমাজের উপর গবেষণা করে দেখান যে, নারীদের ভূমিকার ক্ষেত্রে জৈবিক বিষয়টি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, তিনি দেখান কঙ্গোর বৃষ্টিছায়া অরণ্যের 'Mbuti Pygmies' নামক শিকারি ও সংগ্রহকারী সমাজে কোনো লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন নেই। শিশু লালন পালনও পিতামাতা মিলে করে থাকে এই সমাজে। আবার অস্ট্রেলিয়ার 'Tasmania' উপজাতি সমাজে মহিলারা শীলমাছ শিকার, মাছ ধরা বা ওপোসুম নামক স্তন্যপায়ী প্রাণী শিকারের কাজটি করে থাকে। Oakley আরো বলেছেন যে, আধুনিককালে চীন, রাশিয়া এবং এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার কিছু দেশে সশস্ত্র সামরিক বাহিনীতে মহিলারা কর্মরতা। সুতরাং লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন যে জৈবিক—Murdock-এর এই বক্তব্যকে Oakley বর্জন করেছেন।

সমাজে মহিলা ও শূদ্র উভয়েরই মর্যাদা ছিল নিম্ন। আবার শূদ্র জাতের মহিলাদের মর্যাদা ছিল আরো নিম্ন। অর্থাৎ দ্বিগুণ নিম্ন মর্যাদা এই শূদ্র জাতের মহিলারা ভোগ করতেন। সুতরাং জাতিব্যবস্থার মধ্যে মহিলারা জাতভিত্তিক স্তরবিন্যাস ও লিঙ্গভিত্তিক স্তরবিন্যাস—এই উভয় ধরনের স্তরবিন্যাসে বিন্যাস ছিল এবং তাই সমাজে তাদের অবস্থান ও মর্যাদা ছিল যথেষ্ট নিম্ন। জাতব্যবস্থার মধ্যে যে শুদ্ধ-অশুদ্ধর ধারণা (concept of purity and pollution) প্রচলিত ছিল সেই ধারণাতে মহিলাদের সচলতার মধ্যে বিধিনিষেধ, নারীদের স্থান কিরকম সেই বিষয়টিকে বুদ্ধিজীবীরা দীর্ঘদিন উপেক্ষা করেছেন তাঁদের আলোচনাতে। শ্রেণির সাথে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজনের সম্পর্ক এবং শ্রেণি কাঠামোতে মহিলারা যে ভূমিকা পালন করে সেই বিষয় নিয়েও তেমনভাবে আলোকপাত করা হয়নি। শ্রেণি কাঠামোতে মহিলাদের সুনির্দিষ্ট কোনো অবস্থান না থাকার কারণ হল তাদের দ্বৈত ভূমিকা ও অবস্থান। অর্থাৎ পরিবারে তাদের অবস্থান এবং শ্রমবাজারে তাদের অংশগ্রহণ। বস্তুগত শ্রমবাজারে লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন প্রচলিত থাকার কারণে মহিলারা সমাজে একটি 'sub class' বা উপশ্রেণি হিসাবে অবস্থান করে। কারণ মহিলারা মূলত কম মজুরির নিম্ন মর্যাদার ও অস্থায়ী কাজগুলিতে বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তাই পুজিবাদী সমাজে বেশিরভাগ মহিলা কর্মী শ্রেণি কাঠামোর সীমান্তে অবস্থান করে। তাই Giddens-এর মতে তারা হল "Under class of the white collar sector" (Sen 2012:20)। লিঙ্গগত কারণে তারা শ্রমবাজারে 'Primary' বা প্রাথমিক প্রকৃতির অর্থাৎ বেশি বেতন, স্থায়ী প্রকৃতি ও উচ্চ মর্যাদার কাজগুলিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না বলে তার গৌণ প্রকৃতির কাজগুলিতে (Secondary job) বেশি নিযুক্ত থাকে, যে কাজগুলির অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা কম। বলা যায় এই বিষয়টি শ্রমবাজারে তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে এবং তাই মহিলারা অর্থনৈতিক অবস্থান ও তাদের আয় অনুযায়ী শ্রেণি কাঠামোর নিম্নস্তরেই বেশি অবস্থান করে।

❖ জাত ও লিঙ্গ বৈষম্য (Caste and Gender) :

জাত বলতে আমরা বংশানুক্রমিক এমন এক আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠীকে বুঝি যার সদস্যরা চিরাচরিতভাবে একই ধরনের পেশার সাথে যুক্ত থাকে। Kroeber-এর মতে,

✣ জাত ও লিঙ্গ বৈষম্য (Caste and Gender) :

জাত বলতে আমরা বংশানুক্রমিক এমন এক আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠীকে বুঝি সদস্যরা চিরাচরিতভাবে একই ধরনের পেশার সাথে যুক্ত থাকে। Kroeber-এর জাত হল "an endogamous and hereditary sub-division of an et unit occupying a position of superior or inferior rank or social est in comparison with other such sub-divisions" (Ahuja 2006)। বস্তুত জাত মর্যাদা হল আরোপিত। অর্থাৎ জন্মসূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে জাতি মর্যাদা নিধ হয়। যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বাইরে শোষিত হয় তাই সা

মার্কসীয় তত্ত্বের শ্রেণির ধারণা দিয়ে মহিলাদের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তিনি বলেছেন, মহিলারা পরিবারের মধ্যে যেহেতু মজুরিবিহীন গৃহবধূর ভূমিকা পালন করে তাই তাদের শ্রেণিগত অবস্থানকে তাদের পেশা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে Eichler স্বামীর পেশা দ্বারাও মহিলাদের অবস্থানকে নির্ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ যে পরিবারে মহিলারাও চাকরি করেন সেই পরিবারেও দেখা যায় যে মহিলারা স্বামীর উপরই নির্ভরশীল এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বামীই প্রধান ভূমিকা পালন করে। সাবেকি মার্ক্সবাদ অনুসারে যে সমস্ত গৃহবধূরা চাকরি করেন না তারা শ্রেণিব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তারা শ্রমবাজারে কোনো উদ্বৃত্তমূল্য যেমন উৎপাদন করেন না, তেমনি পণ্য উৎপাদন করে কোনো বিনিময় মূল্যও সৃষ্টি করেন না। গৃহবধূর শ্রমকে ভোগ করে কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যরা যা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ মহিলারা পরিবারে ব্যবহারিক মূল্য (use value) তৈরি করতে পারেন, বিনিময় মূল্য (exchange value) নয়। যে পরিবারে গৃহবধূরা চাকরি করেন সেই পরিবারে মহিলারা দ্বিগুণ বা তিনগুণ শোষিত হয় বলে Eichler মন্তব্য করেন। কারণ যেখানে তারা কাজ করেন তার কর্মকর্তারা উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করে তাকে শোষণ করেন। তারা যে অর্থ উপার্জন করেন তা আত্মসাৎ করেন তার স্বামী। আবার পরিবারে তার কাজ থেকে সৃষ্ট ব্যবহারিক মূল্যকে ভোগ করে পরিবারের সদস্যরা। এইভাবে মহিলারা তিনভাবে শোষিত হয়। Eichler-এর মতে, স্বামীর সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থান দ্বারা মহিলাদের অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করা যায় না। কারণ তার মতে পরিবার কোনো পুজিবাদী প্রতিষ্ঠান নয়। পারিবারিক সম্পর্কগুলো অর্থনৈতিক সম্পর্কের মতো নয়। তাই গৃহবধূরা গার্হস্থ্য কাজগুলি করা সত্ত্বেও তার কাজের ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তারা কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা পান না। এই কারণে Eichler পরিবারকে 'আধা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান' বা 'Quasi-feudal institution' বলে গণ্য করেছেন

মার্ক্সীয় তত্ত্বের শ্রেণির ধারণা দিয়ে মহিলাদের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তিনি বলেছেন, মহিলারা পরিবারের মধ্যে যেহেতু মজুরিবিহীন গৃহবধূর ভূমিকা পালন করে তাই তাদের শ্রেণিগত অবস্থানকে তাদের পেশা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে Eichler স্বামীর পেশা দ্বারাও মহিলাদের অবস্থানকে নির্ধারণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ যে পরিবারে মহিলারাও চাকরি করেন সেই পরিবারেও দেখা যায় যে মহিলারা স্বামীর উপরই নির্ভরশীল এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বামীই প্রধান ভূমিকা পালন করে। সাবেকি মার্ক্সবাদ অনুসারে যে সমস্ত গৃহবধূরা চাকরি করেন না তারা শ্রেণিব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তারা শ্রমবাজারে কোনো উদ্বৃত্তমূল্য যেমন উৎপাদন করেন না, তেমনি পণ্য উৎপাদন করে কোনো বিনিময় মূল্যও সৃষ্টি করেন না। গৃহবধূর শ্রমকে ভোগ করে কেবলমাত্র পরিবারের সদস্যরা যা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যায় না। অর্থাৎ মহিলারা পরিবারে ব্যবহারিক মূল্য (use value) তৈরি করতে পারেন, বিনিময় মূল্য (exchange value) নয়। যে পরিবারে গৃহবধূরা চাকরি করেন সেই পরিবারে মহিলারা দ্বিগুণ বা তিনগুণ শোষিত হয় বলে Eichler মন্তব্য করেন। কারণ যেখানে তারা কাজ করেন তার কর্মকর্তারা উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করে তাকে শোষণ করেন। তারা যে অর্থ উপার্জন করেন তা আত্মসাৎ করেন তার স্বামী। আবার পরিবারে তার কাজ থেকে সৃষ্ট ব্যবহারিক মূল্যকে ভোগ করে পরিবারের সদস্যরা। এইভাবে মহিলারা তিনভাবে শোষিত হয়। Eichler-এর মতে, স্বামীর সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থান দ্বারা মহিলাদের অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করা যায় না। কারণ তার মতে পরিবার কোনো পুজিবাদী প্রতিষ্ঠান নয়। পারিবারিক সম্পর্কগুলো অর্থনৈতিক সম্পর্কের মতো নয়। তাই গৃহবধূরা গার্হস্থ্য কাজগুলি করা সত্ত্বেও তার কাজের ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তারা কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা পান না। এই কারণে Eichler পরিবারকে 'আধা সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান' বা 'Quasi-feudal institution' বলে গণ্য করেছেন (Haralambos & Holborn 2000:181)। মহিলারা তাদের মজুরিবিহীন শ্রমের বিনিময়ে স্বামীর কাছ থেকে খাদ্য, বস্ত্র, নিরাপত্তা ও বাসস্থান পেয়ে থাকে। তাই মহিলাদের অবস্থা অনেকটাই ভূমিদাসদের মতো বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

লিঙ্গ বৈষম্য
(Gender Inequality)

✣ সংজ্ঞা :

লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অসম আচরণ ও অনুভূতিগুলিকেই বলা হয় লিঙ্গ বৈষম্য। অর্থাৎ লিঙ্গ অসাম্য হল এমন এক আইনি, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি যেখানে নারী ও পুরুষের জন্য বিভিন্ন অধিকার ও মর্যাদাগুলি নির্ধারিত হয় তার লিঙ্গের ভিত্তিতে। সামাজিকভাবে নির্মিত লিঙ্গভূমিকার পার্থক্য থেকেই লিঙ্গ অসাম্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। মূলত যখন একই পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের মানুষের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় বা তাদের প্রতি ভিন্ন ধরনের তথা অসম আচরণ পরিলক্ষিত হয় তখনই তাকে লিঙ্গ বৈষম্য বলে। লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে যা দেখা যায় তাহল নারী এবং পুরুষ কখনোই সমান নয় এবং তার ফলে নারী ও পুরুষের জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যগুলি জৈবিক, মানসিক এবং সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের পার্থক্য থেকে উত্থিত হয়।

✣ লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃতি (Nature of Gender Inequality) :

লিঙ্গ বৈষম্যগুলি মূলত সামাজিকভাবে নির্মিত হয় বলে মনে করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষা, জীবন অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিত্ব, পারিবারিক জীবন, কর্মজীবন, ধর্ম, রাজনৈতিক ক্ষেত্র, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। শুধু তাই নয়, লিঙ্গ বৈষম্যগুলি সময়, সমাজ ও সংস্কৃতিভেদেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। জৈবিক তারতম্যের জন্য লিঙ্গ বৈষম্য কতখানি প্রকট তা নিয়ে বিতর্কে না গিয়ে আমরা মূলত সমাজজীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রগুলিতে লিঙ্গ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় এবং সেই বৈষম্যের প্রকৃতি নিয়েই আলোচনা করব নিম্নলিখিতভাবে।

□ **(ক) পরিবারে লিঙ্গ বৈষম্য :** পরিবারের মধ্যেই নারী-পুরুষের বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে। পরিবারের মধ্যে সাবেকি পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্য আজও বর্তমান এবং তাই মেয়েদের

উপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের আধিক্য দেখা যায়। শুধু তাই নয় পরিবারের মধ্যে মহিলারা নির্যাতনের শিকার সবচেয়ে বেশি হয়। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের মতামত প্রাধান্য পায় না। মহিলারা যে গার্হস্থ্য ক্রিয়াকর্মগুলি করে থাকে সেগুলি মজুরিবিহীন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারও বর্তায় পুরুষ সন্তানদের উপর। এমনকি স্ত্রী-ধনসম্পদের উপরও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে দেখা যায়। আজও পুত্র সন্তানকে পরিবারের সম্পদ এবং কন্যাসন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। ফলে কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনাগুলি ঘটে থাকে। যৌনতার উপরও মহিলাদের নিজস্ব মতামত ও নিয়ন্ত্রণ প্রাধান্য পায় না। এক্ষেত্রে স্বামীর কথামতোই তাকে চলতে হয়। বিবাহের পাত্র নির্বাচনে পাত্রীর মতামতের পরিবর্তে পরিবারের পুরুষকর্তা ব্যক্তির মতই গুরুত্ব পায়। নারীবাদীরা তাই বলেন পুরুষজাতির পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার মূল উৎস হল পরিবার। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নারীদের শ্রমকে যেমন শোষণ করা হয় তেমনি পুরুষদের যৌন ক্ষমতার হিংস্র প্রকাশ পরিবারের মধ্যেই ঘটে। তবে আধুনিক সময়ে মহিলারা গার্হস্থ্য কাজের বাইরে মজুরিযুক্ত কাজে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মহিলাদের আয়কে পরিবারের প্রধান আয় বলে গণ্য করা হয় না। এমনকি এই উপার্জিত অর্থ তারা স্বাধীনভাবে খরচও করতে পারে না। এক্ষেত্রে তার উপার্জিত অর্থকে হয় স্বামী বা পরিবারের কর্তাব্যক্তির হাতে তুলে দিতে হয়। সুতরাং পরিবারের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা যায়।

□ **(খ) কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** কিছুকাল পূর্বেও মজুরিযুক্ত কাজগুলিতে পুরুষ প্রাধান্য দেখা গেছে এবং নারীরা গার্হস্থ্য কাজে আবদ্ধ থেকেছে। পরবর্তীকালে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শ্রমবাজারে ও মজুরিযুক্ত কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও কর্মক্ষেত্রে কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্য ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃতিকে আমরা চারভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। যথা—

○ **(১) পেশাগত পৃথকীকরণ (Occupational Segregation) :** পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গ পৃথকীকরণ বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষদের মধ্যে পেশাগুলিকে পৃথকভাগে বিভক্ত করা এবং পুরুষদের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয় এমন পেশাতে পুরুষদের নিযুক্ত করা হয় এবং নারীদের জন্য যে পেশাগুলিকে উপযুক্ত মনে করা হয় সেগুলিতে নারীদেরকে নিযুক্ত করা হয়।

○ **(২) আংশিক সময়ের চাকরিতে কেন্দ্রীভূতকরণ (Concentration in part-time Work :** মহিলারা মূলত আংশিক সময়ের পেশাতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ বেশি পাচ্ছে। এই কাজগুলিতে বেতন কম, উন্নতির সুযোগ কম এবং

আর্থিক নিরাপত্তাও তেমন নেই। অথচ পুরুষেরা উচ্চ বেতনের ও মর্যাদার পূর্ণ সময়ের কাজের সুযোগ বেশি পাচ্ছে।

○ **(৩) মজুরি ব্যবধান (Wage Gap) :** সমকাজে মহিলা ও পুরুষকর্মীদের বেতনের মধ্যেও ব্যবধান তথা বৈষম্য কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

○ **(৪) পেশার ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য (Gender bias in the Job) :** কর্মক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষমতা দখল করে রাখে পুরুষেরা এবং এই বিষয়টি পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পক্ষপাতের ভিত্তি তৈরি করে। দেখা যায় পেশাগত ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধিষ্ঠিত থাকে কোনো পুরুষ ব্যক্তি। শুধু তাই নয় নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে কারণে অকারণে পুরুষ সহকর্মী বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ঠাট্টা, তামাশা, যৌন নির্যাতনও সহ্য করতে হয়।

বলা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে নারীদের বৈষম্যের শিকার হতে হয় মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কারণে।

□ **(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকদের প্রত্যাশা, শিক্ষার্থীদের আচরণ, নিয়ম কানুন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। নারী সাক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় কম। স্কুল কলেজে ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্র ভর্তির হারের তুলনায় কম। এমনকি স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেও মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার হারও মেয়েদের মধ্যেই বেশি। সকল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাতেই পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধিক্য রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম, নিয়ম শৃঙ্খলা, পোশাকবিধি, নিয়ম নির্দেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট। পাঠ্যবইগুলিতেও পাঠ্য এবং ছবিতে লিঙ্গগত ভূমিকার পার্থক্যগুলি চোখে পড়ার মতো। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ছেলে ও মেয়েদের পৃথকীকরণ ঘটানো হয়। যেমন বিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত ছেলেদের জন্য কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ইত্যাদি বিষয়গুলি রয়েছে। মেয়েদের জন্য সেখানে হোম সায়েন্স, সীবনশিল্প ইত্যাদি রয়েছে। আবার পোশাকবিধির ক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য শার্ট, প্যান্ট; কিন্তু মেয়েদের জন্য শাড়ী, স্কার্ট, চুড়িদার প্রচলিত রয়েছে। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলিতে শিক্ষিকা অপেক্ষা শিক্ষকের হার বেশি। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে তা স্পষ্ট।

□ **(ঘ) ধর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** নারীবাদীরা মনে করেন ধর্ম হল পিতৃতন্ত্রের ফসল। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মেই পুরুষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং মহিলারা অধস্তন বলে প্রতিপন্ন হয়। Karen Armstrong-এর মতে, বিশ্বের কোনো প্রধান ধর্মই মহিলাদের জন্য উপকারী নয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মে পুরুষ আধিপত্য বজায়

রয়েছে এবং মহিলাদের প্রান্তীয় অবস্থানে অপসারিত করেছে (Haralambos & Holborn 2000 : 440)। যেমন খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক এবং তার ধর্মীয় সাংগঠনিক ক্রমোচ্চ বিন্যাসে পুরুষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ খ্রিস্টান ধর্মে মনে করা হয় ভগবান হলেন পিতা (পুরুষ চরিত্র)। বাইবেলে অনেক মহীয়সী, দানশীলা নারীচরিত্র খুঁজে পাওয়া গেলেও মুখ্য চরিত্রে পুরুষ প্রাধান্য রয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে মহিলাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন—ইহুদি ধর্মে কেবলমাত্র পুরুষরাই ধর্মীয় ক্রিয়াতে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইসলাম ধর্মে কেবল পুরুষরাই মসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং পুরুষরাই তাদের ধর্মীয় সংগঠনে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। হিন্দুধর্মে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পুরুষরাই পুরোহিত হতে পারে। হিন্দুধর্মে গর্ভবতী অবস্থায় বা ঋতুবতী মহিলারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। এই সময়কালে মুসলিম নারীরাও তার ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ স্পর্শ করতে পারে না। ফরাসি নারীবাদী চিন্তাবিদ Simone de Beauvoir বলেছেন পুরুষরা সাধারণত ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। পুরুষরা যে ধর্মীয় বিধি রচনা করেছে সেখানে পুরুষদের সুবিধা ও আধিপত্যগুলিই প্রতিফলিত হয়েছে। অতিপ্রাকৃত শক্তির সমর্থন নিয়ে পুরুষরা তাদের আধিপত্যকে বজায় রাখে এবং অতিপ্রাকৃত বা স্বর্গীয় ক্ষমতার প্রভু তাই পুরুষ, যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস কোনো নারীর নেই (ibid : 441)।

□ **(ঙ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** ঐতিহ্যগতভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্ট প্রকট। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতা কাঠামো এমনভাবে নির্মিত যে সেখানে নারীর প্রবেশ সহজ ছিল না। তাই সরকার ও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ সাধারণভাবে সীমিত দেখা যায়। রাজনৈতিক জীবন সংগঠিত,পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষদের তৈরি করা নীতি, বিধি, মূল্যবোধ এবং মতাদর্শ দ্বারা। রাজনীতিতে এই পুরুষ প্রাধান্যের ফলে হয় মহিলারা রাজনীতিতে সুযোগ কম পাচ্ছে, নতুবা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে দলগুলি পক্ষপাতিত্ব করে এবং পুরুষ প্রার্থীদেরকেই বেশি পছন্দ করে। রাজনৈতিক দলগুলিতেও পুরুষ অপেক্ষা নারী সদস্যা সংখ্যা অনেক কম। আইনসভাগুলিতেও নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ বা সরকারের প্রধান হিসাবে নারীদের অধিষ্ঠিত থাকতে খুব কমই দেখা যায়। স্থানীয় স্তরে যেমন পৌরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব খুবই কম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৭. লিঙ্গ বৈষম্যের কারণসমূহ (Causes of Gender Inequality) :

কয়েক দশক ধরেই সমগ্র বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য তথা লিঙ্গ সাম্য

৭. লিঙ্গ বৈষম্যের কারণসমূহ (Causes of Gender Inequality) :

কয়েক বছর ধরেই সমগ্র বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য তথা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বলা যায় যে, বিশ্ব লিঙ্গ সমতা অর্জনের অনেক কাছাকাছি পৌঁছেছে। রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীরা উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগও পাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। তবে World Economic Forum-এর হিসাব অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে প্রকৃত লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে হয়তো আরো একশো বছর লেগে যাবে। সুতরাং যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, কেন সমাজে এই লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে? বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনার ভিত্তিতে লিঙ্গ বৈষম্যের সৃষ্টির পিছনে দশটি কারণকে এখানে চিহ্নিত করে আলোচনা করা হল—

❑ **(১) শিক্ষার অসম সুযোগ (Uneven access to education) :** বিশ্ব জুড়ে এখনো পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার হার ও সুযোগ অনেক কম রয়েছে। ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের যুবতীদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ যুবতী এখনো প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেনি। মাত্র ৫৮ শতাংশ মহিলা কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই অর্জন করতে পেরেছে। বিশ্বের সমগ্র নিরক্ষরের দুই-তৃতীয়াংশ হল মহিলা। নারীদের শিক্ষার অসম সুযোগ এবং নিরক্ষরতা লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ বলে তাই মনে করা হয়।

❑ **(২) পেশাগত সাম্যের অভাব (Lack of employment equality) :** বিশ্বের মাত্র ছয়টি দেশ মহিলাদেরকে পুরুষদের মতোই কাজের আইনি সম অধিকার প্রদান করেছে। পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই সমাজে লিঙ্গ অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ **(৩) পেশা বিভাজন (Job segregation) :** বেশিরভাগ সমাজে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, নির্দিষ্ট কিছু কাজ পরিচালনা করার জন্য পুরুষরা বেশি উপযুক্ত এবং কিছু কাজ আছে যেগুলিতে কেবলমাত্র মহিলারাই উপযুক্ত। মূলত দেখা যায় আংশিক সময় এবং কম আয়ের কাজগুলিতে মহিলাদের উপযুক্ত বলে মনে করা হয় এবং বেশি মজুরির ও মর্যাদার স্থায়ী কাজগুলিতে পুরুষরা নিযুক্ত হয়। পেশার এইরূপ বিভাজনের ফলে মহিলাদের আয় কম হয় পুরুষদের তুলনায়। আবার অবৈতনিক শ্রমের জন্যও মহিলাদের কোনো উপার্জন থাকে না। ফলে পেশা বিভাজন লিঙ্গ অসাম্যের অন্যতম কারণ।

☐ **(৪) আইনি সুরক্ষার অভাব (Lack of legal protection) :** বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী এক বিলিয়নেরও বেশি মহিলা গার্হস্থ্য হিংস্রতা এবং গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক হিংস্রতার জন্য কোনো আইনি সুরক্ষা পায় না, যা নারীদের সাফল্যলাভ ও স্বাধীনভাবে বাঁচার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনেক দেশে কর্মক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে এবং জনক্ষেত্রে হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষার অভাব রয়েছে। ফলে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নারীরা বাধার সম্মুখীন হয়। তাই বলা যায় আইনি সুরক্ষার অভাব বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এই অভাব লিঙ্গ অসাম্য সৃষ্টির কারণ হিসাবে কাজ করে।

☐ **(৫) শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব (Lack of bodily autonomy) :** বিশ্বে অসংখ্য মহিলার নিজের দেহ বা শরীরের উপর কোনো কর্তৃত্ব বা অধিকার থাকে না। WHO-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০ মিলিয়নেরও বেশি মহিলা যারা গর্ভবতী হতে চান না তারা গর্ভনিরোধক ব্যবহার করার স্বাধীনতা ভোগ করে না এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন—বিকল্পের অভাব, সহজলভ্যতার অভাব, সামাজিক বা ধর্মীয় বিধিনিষেধ, স্বামীর অনিচ্ছা ইত্যাদি। ফলে বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ গর্ভধারণ পরিকল্পনাহীনভাবে ঘটে, এর মধ্যে ৫০ শতাংশ গর্ভপাত করায় এবং ৩৮ শতাংশ সন্তান জন্ম দেয়। এই সমস্ত মায়েরা তাই রাষ্ট্র বা অন্য কোনো ব্যক্তির উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয় এবং তাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়।

☐ **(৬) চিকিৎসা পরিষেবার দৈন্যতা (Poor medical service) :** মহিলারা সামগ্রিকভাবে পুরুষদের তুলনায় নিম্নমানের চিকিৎসা পরিষেবা পায়। দুর্বল স্বাস্থ্য, অপুষ্টি বা অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধকতা মহিলাদের শিক্ষার ও কাজের সুযোগকে কমিয়ে দেয়। যার ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দারিদ্রতার শিকার তাদের হতে হয়। তাছাড়া মহিলাদের যে সমস্ত রোগ ব্যাধিগুলি পুরুষদের থেকে বেশি ঘটে সেগুলি সম্পর্কেও গবেষণা কম হয়েছে। যেমন মহিলাদের Autoimmune disorder, Chronic pain-এর মতো রোগের তেমন সুরাহা এখনো হয়নি। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছেও অনেক মহিলা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। সুতরাং সঠিক ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার কারণেও মহিলাদেরকে বিভিন্নক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

☐ **(৭) ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব (Lack of religious freedom) :** যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয় তখন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে মহিলারা। মূলত

যখন ধর্মীয় মৌলবাদ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তখন ধর্মীয় স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় এবং এর ফলে লিঙ্গ বৈষম্য সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় বলে World Economic Forum মত প্রকাশ করেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। শুধু অর্থনীতি নয়, শিক্ষা, বিবাহ, রাজনীতি, প্রজনন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবে। অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ।

❑ **(৮) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব (Lack of Political representation) :** রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম শর্ত হল রাজনীতিতে, সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনাতে এবং আইনসভা ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব করা। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের হার পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনেক কম। এই চিত্র প্রায় সমগ্র বিশ্বের। অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ হল রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের অভাব।

❑ **(৯) বর্ণবৈষম্যবাদ (Racism) :** লিঙ্গ অসাম্যের অন্যতম কারণ হল বর্ণবৈষম্যবাদ। মূলত কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা এই বর্ণবৈষম্যের কারণে উন্নত চিকিৎসা, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। বর্ণবৈষম্যের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

❑ **(১০) সামাজিক মানসিকতা (Societal mindsets) :** একটি সমাজের মানুষজনের সামগ্রিক মানসিকতা লিঙ্গ বৈষম্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। সমাজের মানুষ কিভাবে এবং কি ধরনের লিঙ্গ পার্থক্যের মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠা করবে তা নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষের মানসিকতার উপর। যদি সমাজের মানুষের মানসিকতা ও চেতনার মধ্যেই লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ গভীরে প্রবেশ করে থাকে তাহলে সেই সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য হবে অত্যন্ত প্রকট সমাজজীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই। কিন্তু আধুনিক চেতনা, শিক্ষা, যৌক্তিকতায় সমৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা যে সমাজে বেশি হবে সেই সমাজের মানুষের মানসিকতা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন।

যখন ধর্মীয় মৌলবাদ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তখন ধর্মীয় স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় এবং এর ফলে লিঙ্গ বৈষম্য সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় বলে World Economic Forum মত প্রকাশ করেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। শুধু অর্থনীতি নয়, শিক্ষা, বিবাহ, রাজনীতি, প্রজনন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবে। অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ।

❑ **(৮) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব (Lack of Political representation) :** রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম শর্ত হল রাজনীতিতে, সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনাতে এবং আইনসভা ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব করা। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের হার পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনেক কম। এই চিত্র প্রায় সমগ্র বিশ্বের। অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ হল রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের অভাব।

❑ **(৯) বর্ণবৈষম্যবাদ (Racism) :** লিঙ্গ অসাম্যের অন্যতম কারণ হল বর্ণবৈষম্যবাদ। মূলত কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা এই বর্ণবৈষম্যের কারণে উন্নত চিকিৎসা, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। বর্ণবৈষম্যের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

❑ **(১০) সামাজিক মানসিকতা (Societal mindsets) :** একটি সমাজের মানুষজনের সামগ্রিক মানসিকতা লিঙ্গ বৈষম্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। সমাজের মানুষ কিভাবে এবং কি ধরনের লিঙ্গ পার্থক্যের মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠা করবে তা নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষের মানসিকতার উপর। যদি সমাজের মানুষের মানসিকতা ও চেতনার মধ্যেই লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ গভীরে প্রবেশ করে থাকে তাহলে সেই সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য হবে অত্যন্ত প্রকট সমাজজীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই। কিন্তু আধুনিক চেতনা, শিক্ষা, যৌক্তিকতায় সমৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা যে সমাজে বেশি হবে সেই সমাজের মানুষের মানসিকতা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন।

উপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের আধিক্য দেখা যায়। শুধু তাই নয় পরিবারের মধ্যে মহিলারা নির্যাতনের শিকার সবচেয়ে বেশি হয়। পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের মতামত প্রাধান্য পায় না। মহিলারা যে গার্হস্থ্য ক্রিয়াকর্মগুলি করে থাকে সেগুলি মজুরিবিহীন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারও বর্তায় পুরুষ সন্তানদের উপর। এমনকি স্ত্রী-ধনসম্পদের উপরও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হতে দেখা যায়। আজও পুত্র সন্তানকে পরিবারের সম্পদ এবং কন্যাসন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করা হয়। কন্যাভ্রূণ হত্যার মতো ঘটনাগুলি ঘটে থাকে। যৌনতার উপরও মহিলাদের নিজস্ব মতামত ও নিয়ন্ত্রণ প্রাধান্য পায় না। এক্ষেত্রে স্বামীর কথামতোই তাকে চলতে হয়। বিবাহের পাত্র নির্বাচনে পাত্রীর মতামতের পরিবর্তে পরিবারের পুরুষকর্তা ব্যক্তির মতই গুরুত্ব পায়। নারীবাদীরা তাই বলেন পুরুষজাতির পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতার মূল উৎস হল পরিবার। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নারীদের শ্রমকে যেমন শোষণ করা হয় তেমনি পুরুষদের যৌন ক্ষমতার হিংস্র প্রকাশ পরিবারের মধ্যেই ঘটে। তবে আধুনিক সমাজে মহিলারা গার্হস্থ্য কাজের বাইরে মজুরিযুক্ত কাজে যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে মহিলাদের আয়কে পরিবারের প্রধান আয় বলে গণ্য করা হয় না। এমনকি এই উপার্জিত অর্থও তারা স্বাধীনভাবে খরচও করতে পারে না। এক্ষেত্রে তার উপার্জিত অর্থকে হয় স্বামী বা পরিবারের কর্তাব্যক্তির হাতে তুলে দিতে হয়। সুতরাং পরিবারের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা যায়।

□ **(খ) কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** কিছুকাল পূর্বেও মজুরিযুক্ত কাজগুলিতে পুরুষ প্রাধান্য দেখা গেছে এবং নারীরা গার্হস্থ্য কাজে আবদ্ধ থেকেছে। পরবর্তীকালে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শ্রমবাজারে ও মজুরিযুক্ত কাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও কর্মক্ষেত্রে কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্য ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকৃতিকে আমরা চারভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। যথা—

○ **(১) পেশাগত পৃথকীকরণ (Occupational Segregation) :** পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গ পৃথকীকরণ বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষদের মধ্যে পেশাগুলিকে পৃথকভাগে বিভক্ত করা এবং পুরুষদের জন্য উপযুক্ত মনে করা হয় এমন পেশাতে পুরুষদের নিযুক্ত করা হয় এবং নারীদের জন্য যে পেশাগুলিকে উপযুক্ত মনে করা হয় সেগুলিতে নারীদেরকে নিযুক্ত করা হয়।

○ **(২) আংশিক সময়ের চাকরিতে কেন্দ্রীভূতকরণ (Concentration in part-time Work :** মহিলারা মূলত আংশিক সময়ের পেশাতে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ বেশি পাচ্ছে। এই কাজগুলিতে বেতন কম, উন্নতির সুযোগ কম এবং

আর্থিক নিরাপত্তাও তেমন নেই। অথচ পুরুষেরা উচ্চ বেতনের ও মর্যাদার পূর্ণ সময়ের কাজের সুযোগ বেশি পাচ্ছে।

○ **(৩) মজুরি ব্যবধান (Wage Gap) :** সমকাজে মহিলা ও পুরুষকর্মীদের বেতনের মধ্যেও ব্যবধান তথা বৈষম্য কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

○ **(৪) পেশার ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্য (Gender bias in the Job) :** কর্মক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষমতা দখল করে রাখে পুরুষেরা এবং এই বিষয়টি পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পক্ষপাতের ভিত্তি তৈরি করে। দেখা যায় পেশাগত ক্ষেত্রের শীর্ষস্থানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অধিষ্ঠিত থাকে কোনো পুরুষ ব্যক্তি। শুধু তাই নয় নারীদেরকে কর্মক্ষেত্রে কারণে অকারণে পুরুষ সহকর্মী বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ঠাট্টা, তামাশা, যৌন নির্যাতনও সহ্য করতে হয়।

বলা যায় যে, কর্মক্ষেত্রে নারীদের বৈষম্যের শিকার হতে হয় মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কারণে।

□ **(গ) শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষকদের প্রত্যাশা, শিক্ষার্থীদের আচরণ, নিয়ম কানুন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। নারী সাক্ষরতার হার পুরুষদের তুলনায় কম। স্কুল কলেজে ছাত্রী ভর্তির হার ছাত্র ভর্তির হারের তুলনায় কম। এমনকি স্কুল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেও মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার হারও মেয়েদের মধ্যেই বেশি। সকল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাতেই পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের আধিক্য রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম, নিয়ম শৃঙ্খলা, পোশাকবিধি, নিয়ম নির্দেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ বৈষম্য প্রকট। পাঠ্যবইগুলিতেও পাঠ্য এবং ছবিতে লিঙ্গগত ভূমিকার পার্থক্যগুলি চোখে পড়ার মতো। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও ছেলে ও মেয়েদের পৃথকীকরণ ঘটানো হয়। যেমন বিদ্যালয়ের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত ছেলেদের জন্য কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ ইত্যাদি বিষয়গুলি রয়েছে। মেয়েদের জন্য সেখানে হোম সায়েন্স, সীবনশিল্প ইত্যাদি রয়েছে। আবার পোশাকবিধির ক্ষেত্রে ছেলেদের জন্য শার্ট, প্যান্ট; কিন্তু মেয়েদের জন্য শাড়ী, স্কার্ট, চুড়িদার প্রচলিত রয়েছে। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলিতে শিক্ষিকা অপেক্ষা শিক্ষকের হার বেশি। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্ষেত্রে যে লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণ রয়েছে তা স্পষ্ট।

□ **(ঘ) ধর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** নারীবাদীরা মনে করেন ধর্ম হল পিতৃতন্ত্রের ফসল। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মেই পুরুষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং মহিলারা অধস্তন বলে প্রতিপন্ন হয়। Karen Armstrong-এর মতে, বিশ্বের কোনো প্রধান ধর্মই মহিলাদের জন্য উপকারী নয়। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মে পুরুষ আধিপত্য বজায়

রয়েছে এবং মহিলাদের প্রান্তীয় অবস্থানে অপসারিত করেছে (Haralambos & Holborn 2000 : 440)। যেমন খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক এবং তার ধর্মীয় সাংগঠনিক ক্রমোচ্চ বিন্যাসে পুরুষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ খ্রিস্টান ধর্মে মনে করা হয় ভগবান হলেন পিতা (পুরুষ চরিত্র)। বাইবেলে অনেক মহীয়সী, দানশীলা নারীচরিত্র খুঁজে পাওয়া গেলেও মুখ্য চরিত্রে পুরুষ প্রাধান্য রয়েছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে মহিলাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন—ইহুদি ধর্মে কেবলমাত্র পুরুষরাই ধর্মীয় ক্রিয়াতে সম্পূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। ইসলাম ধর্মে কেবল পুরুষরাই মসজিদে প্রবেশ করতে পারে এবং পুরুষরাই তাদের ধর্মীয় সংগঠনে সমস্ত ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। হিন্দুধর্মে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ পুরুষরাই পুরোহিত হতে পারে। হিন্দুধর্মে গর্ভবতী অবস্থায় বা ঋতুবতী মহিলারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারে না। এই সময়কালে মুসলিম নারীরাও তার ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ স্পর্শ করতে পারে না। ফরাসি নারীবাদী চিন্তাবিদ Simone de Beauvoir বলেছেন পুরুষরা সাধারণত ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। পুরুষরা যে ধর্মীয় বিধি রচনা করেছে সেখানে পুরুষদের সুবিধা ও আধিপত্যগুলিই প্রতিফলিত হয়েছে। অতিপ্রাকৃত শক্তির সমর্থন নিয়ে পুরুষরা তাদের আধিপত্যকে বজায় রাখে এবং অতিপ্রাকৃত বা স্বর্গীয় ক্ষমতার প্রভু তাই পুরুষ, যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার সাহস কোনো নারীর নেই (ibid : 441)।

□ **(ঙ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য :** ঐতিহ্যগতভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্ট প্রকট। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ক্ষমতা কাঠামো এমনভাবে নির্মিত যে সেখানে নারীর প্রবেশ সহজ ছিল না। তাই সরকার ও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ সাধারণভাবে সীমিত দেখা যায়। রাজনৈতিক জীবন সংগঠিত,পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় পুরুষদের তৈরি করা নীতি, বিধি, মূল্যবোধ এবং মতাদর্শ দ্বারা। রাজনীতিতে এই পুরুষ প্রাধান্যের ফলে হয় মহিলারা রাজনীতিতে সুযোগ কম পাচ্ছে, নতুবা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে দলগুলি পক্ষপাতিত্ব করে এবং পুরুষ প্রার্থীদেরকেই বেশি পছন্দ করে। রাজনৈতিক দলগুলিতেও পুরুষ অপেক্ষা নারী সদস্যা সংখ্যা অনেক কম। আইনসভাগুলিতেও নির্বাচিত মহিলা সদস্যের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ বা সরকারের প্রধান হিসাবে নারীদের অধিষ্ঠিত থাকতে খুব কমই দেখা যায়। স্থানীয় স্তরে যেমন পৌরসভা ও গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব খুবই কম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য যথেষ্ট পরিমাণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৭. লিঙ্গ বৈষম্যের কারণসমূহ (Causes of Gender Inequality) :

কয়েক বছর ধরেই সমগ্র বিশ্ব লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য তথা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বলা যায় যে, বিশ্ব লিঙ্গ সমতা অর্জনের অনেক কাছাকাছি পৌঁছেছে। রাজনীতিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বেড়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নারীরা উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগও পাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। তবে World Economic Forum-এর হিসাব অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে প্রকৃত লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে হয়তো আরো একশো বছর লেগে যাবে। সুতরাং যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, কেন সমাজে এই লিঙ্গ বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে? বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনার ভিত্তিতে লিঙ্গ বৈষম্যের সৃষ্টির পিছনে দশটি কারণকে এখানে চিহ্নিত করে আলোচনা করা হল—

❑ **(১) শিক্ষার অসম সুযোগ (Uneven access to education) :** বিশ্ব জুড়ে এখনো পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার হার ও সুযোগ অনেক কম রয়েছে। ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের যুবতীদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ যুবতী এখনো প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারেনি। মাত্র ৫৮ শতাংশ মহিলা কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই অর্জন করতে পেরেছে। বিশ্বের সমগ্র নিরক্ষরের দুই-তৃতীয়াংশ হল মহিলা। নারীদের শিক্ষার অসম সুযোগ এবং নিরক্ষরতা লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ বলে তাই মনে করা হয়।

❑ **(২) পেশাগত সাম্যের অভাব (Lack of employment equality) :** বিশ্বের মাত্র ছয়টি দেশ মহিলাদেরকে পুরুষদের মতোই কাজের আইনি সম অধিকার প্রদান করেছে। পেশাগত ক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলেই সমাজে লিঙ্গ অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ **(৩) পেশা বিভাজন (Job segregation) :** বেশিরভাগ সমাজে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, নির্দিষ্ট কিছু কাজ পরিচালনা করার জন্য পুরুষরা বেশি উপযুক্ত এবং কিছু কাজ আছে যেগুলিতে কেবলমাত্র মহিলারাই উপযুক্ত। মূলত দেখা যায় আংশিক সময় এবং কম আয়ের কাজগুলিতে মহিলাদের উপযুক্ত বলে মনে করা হয় এবং বেশি মজুরির ও মর্যাদার স্থায়ী কাজগুলিতে পুরুষরা নিযুক্ত হয়। পেশার এইরূপ বিভাজনের ফলে মহিলাদের আয় কম হয় পুরুষদের তুলনায়। আবার অবৈতনিক শ্রমের জন্যও মহিলাদের কোনো উপার্জন থাকে না। ফলে পেশা বিভাজন লিঙ্গ অসাম্যের অন্যতম কারণ।

□ (৪) আইনি সুরক্ষার অভাব (Lack of legal protection) : বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী এক বিলিয়নেরও বেশি মহিলা গার্হস্থ্য হিংস্রতা এবং গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক হিংস্রতার জন্য কোনো আইনি সুরক্ষা পায় না, যা নারীদের সাফল্যের ও স্বাধীনভাবে বাঁচার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অনেক দেশে কর্মক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে এবং জনক্ষেত্রে হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি সুরক্ষার অভাব রয়েছে। ফলে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নারীরা বাধার সম্মুখীন হয়। তাই বলা যায় আইনি সুরক্ষার অভাব বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে এই অভাব লিঙ্গ অসাম্য সৃষ্টির কারণ হিসাবে কাজ করে।

□ (৫) শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব (Lack of bodily autonomy) : বিশ্বে অসংখ্য মহিলার নিজের দেহ বা শরীরের উপর কোনো কর্তৃত্ব বা অধিকার থাকে না। WHO-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০ মিলিয়নেরও বেশি মহিলা যারা গর্ভবতী হতে চান না তারা গর্ভনিরোধক ব্যবহার করার স্বাধীনতা ভোগ করে না। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন—বিকল্পের অভাব, সহজলভ্যতার অভাব, সামাজিক বা ধর্মীয় বিধিনিষেধ, স্বামীর অনিচ্ছা ইত্যাদি। ফলে বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ গর্ভধারণ পরিকল্পনাহীনভাবে ঘটে, এর মধ্যে ৫০ শতাংশ গর্ভপাত করায় এবং ৩৮ শতাংশ সন্তান জন্ম দেয়। এই সমস্ত মায়েরা তাই রাষ্ট্র বা অন্য কোনো ব্যক্তির উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয় এবং তাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়।

□ (৬) চিকিৎসা পরিষেবার দৈন্যতা (Poor medical service) : মহিলারা সামগ্রিকভাবে পুরুষদের তুলনায় নিম্নমানের চিকিৎসা পরিষেবা পায়। দুর্বল স্বাস্থ্য, অপুষ্টি বা অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধকতা মহিলাদের শিক্ষার ও কাজের সুযোগকে কমিয়ে দেয়। যার ফলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দারিদ্রতার শিকার তাদের হতে হয়। তাছাড়া মহিলাদের যে সমস্ত রোগ ব্যাধিগুলি পুরুষদের থেকে বেশি ঘটে সেগুলি সম্পর্কেও গবেষণা কম হয়েছে। যেমন মহিলাদের Autoimmune disorder, Chronic pain-এর মতো রোগের তেমন সুরাহা এখনো হয়নি। চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছেও অনেক মহিলা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। সুতরাং সঠিক ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা না পাওয়ার কারণেও মহিলাদেরকে বিভিন্নক্ষেত্রে অসাম্য ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

□ (৭) ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব (Lack of religious freedom) : যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয় তখন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে মহিলারা। মূলত

যখন ধর্মীয় মৌলবাদ সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে তখন ধর্মীয় স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় এবং এর ফলে লিঙ্গ বৈষম্য সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় বলে World Economic Forum মত প্রকাশ করেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামী নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। শুধু অর্থনীতি নয়, শিক্ষা, বিবাহ, রাজনীতি, প্রজনন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাবে। অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার অভাব লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ।

□ **(৮) রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের অভাব (Lack of Political representation) :** রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম শর্ত হল রাজনীতিতে, সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনাতে এবং আইনসভা ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিনিধিত্ব করা। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের হার পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অনেক কম। এই চিত্র প্রায় সমগ্র বিশ্বের। অর্থাৎ লিঙ্গ বৈষম্যের অন্যতম কারণ হল রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের অভাব।

□ **(৯) বর্ণবৈষম্যবাদ (Racism) :** লিঙ্গ অসাম্যের অন্যতম কারণ হল বর্ণবৈষম্যবাদ। মূলত কৃষ্ণাঙ্গ মহিলারা এই বর্ণবৈষম্যের কারণে উন্নত চিকিৎসা, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। বর্ণবৈষম্যের কারণে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়।

□ **(১০) সামাজিক মানসিকতা (Societal mindsets) :** একটি সমাজের মানুষজনের সামগ্রিক মানসিকতা লিঙ্গ বৈষম্যের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। সমাজের মানুষ কিভাবে এবং কি ধরনের লিঙ্গ পার্থক্যের মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠা করবে তা নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষের মানসিকতার উপর। যদি সমাজের মানুষের মানসিকতা ও চেতনার মধ্যেই লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ গভীরে প্রবেশ করে থাকে তাহলে সেই সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য হবে অত্যন্ত প্রকট সমাজজীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই। কিন্তু আধুনিক চেতনা, শিক্ষা, যৌক্তিকতায় সমৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা যে সমাজে বেশি হবে সেই সমাজের মানুষের মানসিকতা লিঙ্গ সাম্য প্রতিষ্ঠার উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন।